শ্রদ্ধাঞ্জলী

স্মরণে বরণে ...
পাঁচ বাঙালি কিংবদন্তির
জন্মদ্বিশতবর্ষে/শতবর্ষে
স্মরণিকা ১৪২৭-এর
বিনম্র নিবেদন

“শ্রদ্ধাঞ্জলি”

জন্ম দ্বিশতবার্ষিকীর আলোকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাসব বসাক
এফ.ই ৫১২/৭

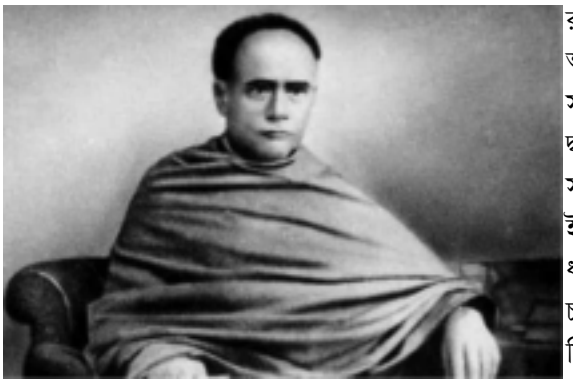

সন্দেহ নেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর সমকালীন সময়ের থেকে অনেকখানি এগিয়ে থাকা একজন মানুষ। পন্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র, সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র, শিক্ষা সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র—ঋজু ব্যক্তিত্বের এই যুগপুরুষের জীবন ও সংগ্রাম আজও আমাদের অভিভূত করে। পূর্ণাঙ্গ মানুষটাকে জানার, চেনার বিস্ময় বুঝি শেষ হওয়ার নয়। তবু কি সবটুকু চেনাজানা হয়? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ যেন সেই অন্ধের হস্তিদর্শন হ'য়ে ওঠে।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যে কোনো আলোচনাই, উনবিংশ শতাব্দীর সেই গভীর তমসাচ্ছন্ন কূপমণ্ডুক সমাজ ও তার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় নবজাগরণের আলোর বিভায় আলোকিত কতিপয় মানুষের পুঞ্জীভূত প্রতিবাদের অভিনব পরিসরের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে করতে গেলে সেই আলোচনা উন্মার্গগামী হ'য়ে অসম্পূর্ণতার কানাগলিতে অবরুদ্ধ হতে বাধ্য। বরং তাঁর সময়কালের প্রেক্ষাপটেই বিদ্যাসাগরকে বোঝার চেষ্টা করা উচিৎ আমাদের।

আজ থেকে ঠিক দু'শ বছর আগে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের জন্ম। তাঁর জন্মের মাত্র বছর তিনেক আগে ১৮১৭ তে ডেভিড হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে রামমোহন রায়ের সহায়তায় স্থাপিত হয়েছে 'হিন্দু কলেজ (যা কিনা আজকের প্রেসিডেন্সি) আর সেই কলেজের তরুণ শিক্ষক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—ফরাসি বিপ্লবের এই মূল স্লোগান দ্বারা অনুপ্রাণিত হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে সমান সম্পর্কে আদ্যন্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন সেকেলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অচল ধ্যানধারনা সঞ্জাত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে; বিদ্যাসাগরের তখন কিশোরবেলা। ডিরোজিওর কর্মকাল ছিল ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ; অর্থাৎ কিনা যে সময়টায় ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবের চৌকাঠ পেরিয়ে সবে মাত্র কৈশোরে পা রাখার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

১৮৩৯ এ যখন রামমোহন প্রবর্তিত সমাজসংস্কারের ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের পিতা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থাপন করছেন তত্ত্ববোধিনী সভা, তখন ঈশ্বরচন্দ্র ১৯এর যুবক। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করছেন তখন তাঁরই সমবয়সী আর এক জ্ঞানদীপ্ত, যুক্তিবাদী, আদ্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক উজ্জ্বল যুবক অক্ষয় কুমার দত্ত। তাঁর জন্ম ওই ১৮২০ সালেই। এহেন অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরকে ওই পত্রিকার লেখা নির্বাচনের কমিটিতে থাকার অনুরোধ করলে তিনি সেই অনুরোধ সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে বাঙালি শিক্ষিত সমাজকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রতি আকৃষ্ট করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। যদিও পরবর্তীকালে নিরীশ্বরবাদী অক্ষয় দত্ত দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে পত্রিকা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন।

মনে রাখা ভাল রামমোহন রায় বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়ে, তার ভিত্তিতেই ধর্মসংস্কারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি আর যাই হোক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বাদ দেন নি। বিদ্যাসাগর কিন্তু সে পথে হাঁটতে আদৌ রাজি

ছিলেন না। ভারতীয় সমাজ ও শাস্ত্রের গভীর অধ্যায়নের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় আলোকিত বিদ্যাসাগর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাই জানিয়ে দিতে পেরেছিলেন, 'সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন হিসাবে ভ্রান্ত'। ঠিক এইখানেই রামমোহনের সময়পর্বে যে রেনেশাঁর সূচনা, সেই রেনেশাঁর চিন্তার জগতে একটি গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। এই প্রথম তার ভিত্তি নির্মিত হ'তে দেখা গেল ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত এক আদ্যন্ত আধুনিক সেকুলার ও বস্তুনিষ্ঠ মানবতাবাদের ভিত্তির ওপর। যে চিন্তার মূল কথা যাবতীয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় কূপমন্ডুকতা মুক্ত যুক্তিনিষ্ঠ মানবিকতার চর্চা। তাই তিনি অক্লেশে বলতে পারেন, 'হাজার হাজার বছর ধরে কোনো কিছুকে সত্য বলে জেনে এসেছি মানেই তা সত্য এমনটা নয়।' একমাত্র প্রমাণের মধ্যে দিয়েই উত্তীর্ণ হতে হবে সত্যকে। এর থেকে বড় বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় আর কিই বা হ'তে পারে।

মনে রাখা ভালো বিদ্যাসাগর মশাই বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ছাত্র না হয়েও তিনি ছিলেন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানা গ্রন্থের এক নিবিড় পাঠক। তিনি ইংল্যান্ড থেকে নিয়মিত ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও ইউরোপীয় দর্শনের নানা ধরনের বই আনাতেন। শোনা যায় তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরিতে কুড়ি হাজারের বেশি বই ছিল। সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি পঠনপাঠন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ক'রে তাকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'Notes on Sanskrit College' শীর্ষক একটি ২৬ পৃষ্ঠার নোট তিনি তদানীন্তন বৃটিশ শিক্ষা আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দাবি করেন সংস্কৃত ভাষায় লীলাবতী গণিত পড়ানোর কোনো অর্থ নেই। তার পরিবর্তে ইংরাজিতে পাশ্চাত্য গণিত পড়ানোটা অনেক বেশি জরুরি; কেননা এর ফলে ছাত্রদের সময় অনেকখানি বাঁচবে এবং একই সঙ্গে আধুনিক গণিত সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে। ওই নোটে তিনি লিখছেন, ''কতগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, সে সম্পর্কে এখন আর বিশেষ মতভেদ নাই। তবে ভ্রান্ত হ'লেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। তাই সংস্কৃতে যখন এইগুলি পড়াতেই হবে তখন তার প্রতিষেধক হিসাবে ছাত্রদের ভালো ভালো ইংরাজি দর্শনশাস্ত্রের বই পড়ানো দরকার।" এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে শিক্ষা অধিকর্তা ব্যালেন্টাইনের মতবিরোধ হয়েছিল। কেননা ব্যালেন্টাইন তাঁর নিজের করা মিলের দর্শনের সংক্ষিপ্তসার ও বার্কলের দর্শন পড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সেটা চান নি। কেননা তিনি সঠিক ভাবেই বুঝেছিলেন এতে ভাববাদের ভিতই দৃঢ় হবে মাত্র। তিনি লিখছেন, ''শাস্ত্রে যার বীজ আছে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে সেই সত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত। —শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে। তারা মনে করেন যেন শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে। বিজ্ঞানের হয় নি।" তিনি আরও লেখেন, ''প্রগতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তত্ব ও তথ্য ভারতীয় পন্ডিতদের সমাদরযোগ্য করা রীতিমতো কঠিন। তাঁদের কুসংস্কারগুলি বহুকালের সঞ্চিত ও দৃঢ়মূল।"

বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন বলেই তো তাঁর স্বপ্ন ছিল, তাঁর কথাতেই বলা যায়, ''শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে।" আর শিক্ষককরা কেমন হবে? তিনি লিখছেন, ''মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল ও প্রয়োজনীয় বহু বিশেষ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি—শিক্ষকের এই গুণগুলি থাকা আবশ্যক। এই ধরনের দরকারি লোক গড়িয়া তোলাই আমার সংকল্প"।

আজ যে স্কুল-কলেজে আমরা রবিবার ছুটি পেয়ে থাকি। তার পিছনেও কিন্তু বিদ্যাসাগরের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন সেখানে ধর্মীয় তিথি অনুযায়ী সপ্তাহে দু'দিন ছুটির প্রচলন ছিল। কিন্তু তিথি অনুযায়ী ছুটির সমস্যা হ'ল প্রতি সপ্তাহে কোনো দু'টি নির্দিষ্ট দিনেই যে ধর্মীয় তিথির সমাপতন হবে এমন কোনো মানে নেই। ফলে প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিন বদলে যেত। বিদ্যাসাগর কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে ধর্মীয় তিথির পরিবর্তে প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্টভাবে রবিবার ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানান, যে দাবি কর্তৃপক্ষ মেনে নেন।

ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামি তাঁকে ছুঁতে পারে নি

কখনো। ১৮৫১র ২২শে জানুয়ারি তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন আর তার মাত্র দু'মাসের মধ্যেই, ২৮শে মার্চ তিনি শিক্ষা সচিবকে চিঠি দিয়ে অব্রাহ্মনদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়ার জোরালো আবেদন জানান; যা গ্রাহ্যও হয়। কূপমন্ডুক সমাজে এ নিয়ে তখন কিছু কম আলোড়ন হয় নি। তথাকথিত ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা বিদ্যাসাগরের নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন সেদিন। তিনি অবশ্য সে সবের পরোয়া করেন নি কখনো।

আগেই বলেছি তিনি সেই অর্থে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু আধুনিক মননের এই মানুষটি বিজ্ঞানের নানা তত্ব, তথ্য, আবিষ্কার ও অগ্রগতি সম্পর্কে রীতিমতো খোঁজখবর রাখতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার সমসাময়িক আর এক দিকপাল ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ডাক্তার সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভা, যা কাল্টিভেশন অব সায়েন্স নামে সমধিক পরিচিত, তাতে সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানের মৌলিক কোনো বই না লিখলেও ছাত্রদের বিজ্ঞানমনস্ক ক'রে গড়ে তুলতে তিনি বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। উইলিয়াম চেম্বার্স ও রবার্ট চেম্বার্স ভ্রাতৃদ্বয়ের রচিত 'Exemplary Biography' থেকে বাছাই ক'রে তিনি বাংলা ভাষায় ন'জন দিকপাল ব্যক্তিত্বের জীবনী সঙ্কলন 'জীবনচরিত' রচনা করেন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে, যার মধ্যে ছ'জনই ছিলেন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী। সেই বইয়ে জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও; পদার্থবিদ নিউটন; উদ্ভিদবিদ ক্যারোলা লিনিয়াস, অথবা ভূগোলবিদ ডুবালদের জীবনী ও কর্মকান্ড স্থান পায়। বইটির শেষে তিনি কিছু শব্দের পরিভাষা যুক্ত করেন, যার বেশ কিছু আমরা আজও ব্যবহার করে থাকি। ওই বইয়ে গ্যালিলিওর পর্যবেক্ষণ ও তত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখছেন, ''এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।" লক্ষনীয় যে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি প্রচলিত জ্যোতিষশাস্ত্র না বলে বলছেন জ্যোতির্বিদ্যা। মানে এ্যাস্ট্রোলজি নয়, এ্যাস্ট্রোনমি। ভাবা যায়।

জীবনচরিত গ্রন্থে কোপার্নিকাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তার উপলব্ধির কথা লিখছেন, ''পূর্বকালীন লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, সুতরাং স্বয়ং তত্ব নির্ণয় করিতে পারিতেন না। এবং অন্যে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেও, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিকের এই রীতি ছিল, পূর্বাচার্যেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোনও বিষয়, তাহার বিরুদ্ধতা বা বিরোধ আভাসমান হইলে, তাঁহারা শুনিতে চাহিতেন না।" —কি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও যুক্তিবাদী মনন থাকলে উনবিংশ শতাব্দী মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে এমন যুক্তিনিষ্ঠ ও দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা করা যায়—সে কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমনস্কতার আলোচনা করতে হ'লে 'বোধোদয়'—চতুর্থ ভাগের কথা উল্লেখ করতেই হয়। মূলত Chamber's Rudiments of Knowledge বইটির অনুসরণে বোধোদয় রচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। সেখানে জড়পদার্থ থেকে শুরু ক'রে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ধাতু, কৃষিবিজ্ঞান, জল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি বিজ্ঞানের নানা শাখার বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সহজ সরল ক'রে বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন বোধোদয়ে। যেমন সেখানে ইন্দ্রিয় বিষয়ে লিখতে গিয়ে তিনি লিখছেন, ''ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বপ্রকার জ্ঞান জন্ম। ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র জানিতে পারিতাম না।—ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। —ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হয়। অভিজ্ঞতা লাভ হইলে ভাল-মন্দ, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি জন্মে"। তার মানে, প্রায় সব ধরনের ধর্মশাস্ত্রে যা বলে, ঈশ্বর বললেন let there be knowledge and knowledge comes to exist এমনটা নয়।

মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগর যখন এসব লিখছেন তখন ইউরোপে সদ্য Natural Philosophy শব্দবন্ধটি Science শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হ'তে শুরু করেছে। ইংল্যান্ডে প্রত্নতাত্বিক প্রমাণের দ্বারা যুক্তি ও বিজ্ঞান নির্ভর বিবর্তন তত্বের যে সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন ডারউইন, গোঁড়া ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিকতা ও বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্বের দাপটে

সেই সিদ্ধান্ত তখনও জনসমক্ষে প্রকাশ করার মত সাহস অর্জন ক'রে উঠতে পারেন নি তিনি। তাঁর ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদ গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে আরও অনেকটা পরে ১৮৫৯ এ গিয়ে। অথচ বিদ্যাসাগর সেই সময়ে দাঁড়িয়েও ভাববাদী ক্রিয়েশনিজম বা সৃষ্টিতত্ব নিয়ে কার্যত নীরব থেকেছেন। বরং নদী, সমুদ্র ইত্যাদি সৃষ্টির পিছনে একেবারে বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটুকুই বিবৃত করেছেন কেবল। কোনো এক অপার্থিব সৃষ্টিকর্তা নির্দেশ দিলেন আর অমনি কুলকুল ক'রে নদী বইতে শুরু করলো—এমন ধর্মীয় ব্যাখ্যার পথে হাঁটেন নি তিনি।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে তাঁকে কোনোদিন কোনো মন্দির বা দেবস্থানে যেতে দেখেছেন এমন দাবি কেউ করতে পারেন নি। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক অমিয় কুমার হাটি সঠিক ভাবেই তাঁর রচিত 'বিদ্যাসাগর, বিজ্ঞানমনস্কতা ও জনস্বাস্থ্যচেতনা' বইটিতে লিখেছেন, ''বিদ্যাসাগর কোনো ধর্মযাজকের কাছে ঘেঁষেন নি—মন্দিরে যান নি। পূজা আর্চা করতেন না। কিন্তু ছিলেন মানবতায় উদ্বুদ্ধ দয়ার সাগর।'' যাবতীয় কুসংস্কারমুক্ত আদ্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক এই মানুষটি ধর্মের ব্যাপারে এতটাই নির্লিপ্ত ছিলেন যে তাঁর অন্যতম জীবনীকার বিহারীলাল সরকার (যিনি নিজে ছিলেন গোঁড়া হিন্দু) চরম খেদের সঙ্গে লিখছেন, ''অধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া, ব্রাহ্মণ পন্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি, হিন্দু ধর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন?... বিদ্যাসাগর কালের লোক। কালধর্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে, হিন্দু ধর্মে আঘাত লাগিয়াছে... নিষ্ঠাবাণ ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর, উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।'' —শেষ লাইনটা জীবনীকারের ধর্মীয় গোঁড়ামি সর্বস্ব আবেগ তাড়িত অতিশয়োক্তি সন্দেহ নেই। কেননা বিদ্যাসাগরের মত মেধাবী মানুষ অভ্যাস করেও গায়ত্রী মন্ত্র মনে রাখতে পারবেন না এমনটা মনে হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না। আসলে বিদ্যাসাগর ওই ব্রাহ্মণত্বই হোক আর গায়ত্রীই হোক এগুলোকে কখনোই 'জীবন সর্বস্ব' বলে মানেন নি। মোদ্দাকথা হ'ল তিনি কখনো কোনো অবস্থাতেই ধর্মতন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা পড়তে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর অন্যতম জীবনীকার চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রায় একই কথা বলেছেন, ''তাহার নিত্যজীবনের আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না। অপরদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের লক্ষণের পরিচয়ও কখনো পাওয়া যায় নি।'' তবে বিদ্যাসাগরের ধর্মচিন্তা সম্পর্কে আসল কথাটা লিখেছেন তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ''অগ্রজ মহাশয় শৈশবকাল হইতে কাল্পনিক দেবতার প্রতি কখনোই ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতেন না। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুগণ দেবদেবী প্রতিমার প্রতি যেরূপ হৃদয়ের সহিত ভক্তি প্রকাশ করেন, তিনি জনক-জননীকে বাল্যকাল হইতে তদ্রুপ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিতেন।''

শম্ভুচন্দ্রের লেখায় পাচ্ছি, 'ধর্মপ্রচারক কয়েকজন কৃতবিদ্য লোকের' প্রশ্নের জবাবে বিদ্যাসাগর ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নির্মোহ বিশ্লেষণ হাজির করছেন, ''ধর্ম যে কি তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোনো প্রয়োজন নাই।'' উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলা তথা ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে কার্যত ধর্মকে এইভাবে সরাসরি অস্বীকার করতে খুব কম লোককেই দেখা গেছে।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণ দেবের একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল যার বিস্তৃত বিবরণ কথামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত মানুষও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের পক্ষে একটি বাক্যও বিদ্যাসাগরকে দিয়ে বলাতে পারেন নি। রামকৃষ্ণের কথার জবাবে বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেছিলেন, 'ঈশ্বরকে ডাকবার আর দরকার কি'। তারপরেই তিনি চেঙ্গিজ খাঁর লুটতরাজ ও হত্যালীলার প্রসঙ্গ টেনে এনে রামকৃষ্ণকে বলছেন, ''এই হত্যাকান্ড তো ঈশ্বর দেখলেন, কই, একটু নিবারণ তো করলেন না। তা, তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোনো উপকার হচ্ছে না।'' এ যেন সেই ঘোরতর বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনেরই অনুরণন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য লিখছেন, ''বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধহয় তোমরা জানো না, যাহারা জানিতেন তাহারা তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত হইত না।'' এই প্রসঙ্গে তিনি ডেভিড হেয়ারের নাস্তিকতা

বা ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আলোয় আলোকিত ডিরোজিওর দ্বারা ভগবানকে সরিয়ে reason বা যুক্তির পূজার উল্লেখ ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছেন যে এদের প্রভাব বিদ্যাসাগরের ওপর ছিল বলেই 'বিদ্যাসাগর নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?'

আমরা সকলেই অবগত আছি যে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে গিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়া ধর্মগুরু ও তথাকথিত পন্ডিতদের কি ভয়ানক আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। কোনো ভাবে এঁটে উঠতে না পেরে তারা যখন বিধবা নারীকে পুনর্বিবাহ হ'লে নরকে স্থান পাওয়ার ভয় দেখাতে শুরু করে তখন তিনি ঠাট্টা ক'রে যে শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছিলেন তা তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও অপরিসীম বিজ্ঞানমনস্কতারই পরিচায়ক। ব্রজবিলাসে তিনি নরক প্রসঙ্গে ওই তথাকথিত পন্ডিতদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ''যদি নরক নামে বাস্তবিকই কোনও স্থান থাকে, এবং কাহারও পক্ষে সেই নরকপদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে; তাহা হইলে টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশদের পাল সর্বাগ্রে নরকে যাইবেন, এবং নরকের সকল জায়গা দখল করিয়ে ফেলিবেন, আমরা আর সেখানে স্থান পাইবো না।" কি দৃঢ় প্রত্যাঘাত! কি ভয়ঙ্কর শ্লেষ! যুগ যুগ লালিত কুসংস্কারকে কি অসম্ভব অবজ্ঞায় ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া। এ বোধহয় একমাত্র বিদ্যাসাগরের পক্ষেই সম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে সত্যিই যথার্থ মূল্যায়ণটি করেছেন, ''বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ; আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে তিনি দেবতা বলে মানেন নি। তাকে আঘাত করেছেন"।

নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত যে বছর বাংলায় জন্মগ্রহণ করছেন, তার ঠিক দু বছর আগে জার্মানির ট্রিয় শহরে জন্ম নিয়েছেন কার্ল মার্কস, যিনি পরবর্তী কালে হয়ে উঠবেন পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক, আর বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্তদের জন্মের বছর, অর্থাৎ ওই ১৮২০তেই জন্ম নিচ্ছেন ফ্রেডরিথ এঙ্গেলস। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের কালজয়ী কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লিখেছেন ১৮৪৮ এ, জার্মান ভাষায়; যার প্রথম ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫০এ; যদিও প্রথম ইংরাজি সংস্করণের সংখ্যা ছিল খুবই অপ্রতুল। কিন্তু এর বছর চারেক আগেই মার্কস তাঁর A Critique of Hegel's Right Philosophy লিখে ফেলেছেন, যেখানে তিনি ধর্ম সম্পর্ক এক আদ্যন্ত যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। সে লেখা বিদ্যাসাগর পড়েছিলেন এমন দাবি করতে পারি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এমন স্বচ্ছ ও যুক্তিনিষ্ঠ ধারনা, এমন নির্মোহ বিশ্লেষণ-বিশেষ ক'রে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের প্রমত্ততার আবহে দাঁড়িয়ে, আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে।

স্বাভাবিকভাবেই এমন একজন বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষ যুগে যুগে, কালে কালে মৌলবাদীদের কাছে রীতিমতো ভয়ের; আতঙ্কের। তাই এত বছর পরেও বিদ্যাসাগর মৌলবাদীদের সফ্‌ট টার্গেট। এত বছর পরেও বারবার তাঁর মূর্তির ওপর আছড়ে পড়তে দেখা যায় ধর্মান্ধ মৌলবাদের নিষ্ফল আক্রোশ। বিদ্যাসাগর মানে কেবলমাত্র রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পড়াশোনা করা সদ্য গ্রাম থেকে কোলকাতায় আসা এক বালকের কাহিনি নয়; বিদ্যাসাগর মানে মাইলস্টোন দেখে ইংরাজি সংখ্যা চেনা নয়; বিদ্যাসাগর মানে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতে মায়ের ডাকে সাড়া দিতে স্রোতস্বিনী উন্মত্ত দামোদর সাঁতরে পার হওয়ার গল্পগাথা নয়; বিদ্যাসাগর মানে শুধু বর্ণ পরিচয় আর গোপাল অতি সুবোধ বালক নয়, বিদ্যাসাগর মানে কেবলমাত্র বিধবাবিবাহ আর নারী শিক্ষার প্রবর্তন নয়; বিদ্যাসাগর মানে অপমানের বদলা নিতে সাহেবকে দেখে টেবিলে পা তুলে দেওয়া নয়। বিদ্যাসাগর মানে স্রোতের বিপ্রতীপে হাঁটা যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমনস্ক এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এক অসামান্য সমাজসংস্কারক, এক দৃঢ় চেতা অধ্যাপক—বিদ্যাসাগর মানে এক চলমান সংগ্রাম। তাঁর এই বিজ্ঞানমনস্কতা, এমন যুক্তিবাদী মনন উপলব্ধি করা ও তার নিবিড় চর্চা করার মধ্যে দিয়েই একমাত্র তাঁকে স্মরণ করার সার্থকতা। মৌলবাদের আস্ফালনের এই ক্লেশিত সময়ে বিদ্যাসাগরই হ'তে পারেন আপামর বাঙালির সত্যিকারের আইকন। সত্যিকারের আলোকবর্তিকা। এই উন্মার্গগামী সময়ে আমাদের পথ দেখান বিদ্যাসাগর।

দ্বিশত-জন্মবার্ষিকীতে অক্ষয়কুমার দত্ত

ড. মহুয়া ভট্টাচার্য
এফ.ই ১৪৮

কোনো কোনো মানুষ আসেন পৃথিবীতে যাঁরা তাঁদের সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকেন। দেখতে পান অনেকটা দূরবর্তী কালকে, অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন সেই রকম একজন মানুষ। ১৮২০ সালে জন্ম। এবছর তাঁর ২০০৩ম জন্মদিন চলে গেল ১৫ জুলাই। বাংলা গদ্যের অন্যতম পথিকৃত অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০) সমসাময়িক এবং দুজনেই বাংলা ভাষা ও গদ্য সাহিত্যের দুই দিকপাল। বাংলা গদ্যের লিখিত রূপ যখন সুচারুভাবে গড়ে ওঠেনি, তখন এঁদের প্রতিভা ও প্রয়াস বাংলা ভাষাকে সাবালকত্বের পথ দেখিয়েছে।

দেশ, সমাজ ও ভাষার তখন ভাঙাগড়ার যুগ। নানা সমস্যায় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে সমস্ত জর্জরিত। অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের এই যুগে বাংলা ভাষা ও গদ্যকে অক্ষয়কুমার আনলেন পাঠ্যপুস্তকের কেন্দ্রে, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ও সংবাদপত্রের পাতায়। কাব্যরচনা ('অনঙ্গমোহন') দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও তিনি গদ্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। তবে গল্প উপন্যাস তিনি লেখেন নি, লিখলেন জ্ঞানের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ভূগোলের পাঠ, যুক্তিশীল মননশীল প্রবন্ধ যা পাঠকের মনকে সংস্কারমুক্ত করে। তাঁর সময়ের ধর্মনির্ভর কাব্য, কবিওয়ালাদের স্থূল চাপান-উতোর, বদ্ধ সমাজের অনড় নেতিবাচক সংস্কারের পাশাপাশি কলকাতা-কেন্দ্রিক ইংরেজি শিক্ষা কিছু মানুষের মধ্যে তখন নানা বিষয়ে প্রশ্ন ও কৌতূহলও জাগাচ্ছিল। সৃষ্টি হচ্ছিল হিন্দুধর্মের অমূলক সংস্কারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্রাহ্মধর্ম স্থাপন করে ধর্মীয় সংস্কারে সবেমাত্র উদ্যোগী হয়েছেন। এই সময়েই নবজাগরণের পথিকৃত অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব। আজকের বিজ্ঞান-নির্ভর সমাজে যাঁরা আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন।

অক্ষয়কুমার নবদ্বীপের চুপিগ্রামে পাঠশালায় সংস্কৃত ও ফার্সীর পাঠ নিয়ে পরে কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ইংরেজিভাষা চর্চা করেন। জার্মান শিক্ষক হার্ডম্যান জেফ্রয়ের অনুপ্রেরণায় গ্রীক, লাতিন, হিব্রু ও জার্মান ভাষা শেখেন। তাঁরই বদান্যতায় হোমারের ইলিয়ড, ভার্জিলের ঈনীড থেকে শুরু করে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, গণিত, নৃতত্ত্ব, বিবর্তনতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান বিষয়ে প্রামাণ্য বই সুলভে পাঠ ও চর্চা করতে সমর্থ হন। যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তাঁকে উদার ও আধুনিক হতে এবং সে যুগে ব্যতিক্রমীরূপে গড়ে তুলেছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত ও 'সম্বাদ প্রভাকর'-এর সংস্পর্শে এসে তিনি সাংবাদিক সুলভ বাংলা গদ্য-নিবন্ধ লিখতে শুরু করেন। পরিচিত হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় মহর্ষি তাঁকে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক পদে নিয়োগ করেন। ১৮৪৩-এর ১৬ আগস্ট

তাঁর সম্পাদনায় প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট ও সংস্কারপন্থী লেখকবর্গ নিয়ে তখন যেন বাংলা ভাষায় নবযুগের সূচনা হল। মহর্ষির পাঠশালার শিক্ষক হিসেবে অক্ষয়কুমার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার সুযোগ পেলেন যা ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হতো। তত্ত্ববোধিনীতে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, অবতারতত্ত্ব, ভাবাবেগকে নিন্দা করে ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শের প্রচারই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সদ্যভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের পারিশ্রমিক ছিল প্রথমে ৩৯ টাকা, পরে তাঁর দক্ষতায় তা ৪৫ ও ৬০ টাকা হয়। ফুলস্কেপ কাগজের আকারে প্রকাশিত পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮-১২। প্রথমে একাধিক বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মতবিরোধ হয়। ব্রাহ্মধর্মের সমস্ত ভাবাদর্শকেও তিনি সব সময় মেনে নিতে পারেন নি। ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃতের বদলে বাংলাকে ঈশ্বর উপাসনার মাধ্যম করেছিলেন কিছুটা জেদের বশেই। অস্বীকার করেছেন বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততা। তাঁর যুক্তি ছিল বেদ মানুষের রচিত, অতএব নির্ভুল নয়। পরে উপাসনা ও প্রার্থনার প্রয়োজনও অস্বীকার করেন। ধর্মীয় কট্টর পন্থায় আচ্ছন্ন ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও কুসংস্কারের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও যুক্তিবাদী মন অক্ষয়কুমারকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হিসেবেই ব্যতিক্রমী ও চিহ্নিত করেছিল। তাঁর নিজের লেখা প্রবন্ধে সমসাময়িক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর নির্ভীক মতামত প্রকাশ পেত। জমিদারী প্রথা, নীল চাষ বিষয়ে তাঁর মতামত উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথও পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমারের গভীর প্রজ্ঞা ও পারদর্শিতার গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন।

তাঁর প্রথম কর্মজীবনে 'সম্বাদ প্রভাকর' উনিশ শতকের একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা ছিল, যাতে ভারতবর্ষসহ বহির্বিশ্বের সংবাদের পাশাপাশি ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমৃদ্ধ রচনা প্রকাশিত হতো। এর প্রাথমিক রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিও পরে নমনীয় ও উদার হয়েছিল কিছুটা। বাংলার রেনেসাঁসের ভাবধারার কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছিল এতে। জনমত গঠনে এর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর ভাষাও ছিল তুলনামূলকভাবে প্রাঞ্জল ও মনোগ্রাহী।

১৮৪২-এ নিজের উদ্যোগে 'বিদ্যাদর্শন' নামে মাসিক পত্রিকা চালু করেন, কিন্তু এটি বেশিদিন চলেনি। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫-এই বারো বছর প্রচুর শ্রমে ও যত্নে 'তত্ত্ববোধিনী'-র প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা এনেছিলেন। এর গ্রাহক সংখ্যা সাতশো ছুঁয়েছিল। এই পত্রিকা ও পাঠশালায় যুক্ত থেকেই ছোটদের জন্য তিনি বেশ কয়েকটা স্কুল-পাঠ্য পুস্তিকা লেখেন। 'ভূগোল' তার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪১-এ যাতে পৃথিবী ও বাহ্যবস্তু নিয়ে নানা প্রশ্ন, কৌতূহল ও তথ্যের সমাবেশ দেখা যায়। এরপর তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয় 'চারুপাঠ' গ্রন্থ ১৮৫৩-৫৯-এর মধ্যে। এতে নানা বিষয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ শিশুপাঠ্য প্রবন্ধ সংকলিত হয়। 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থও রচনা করেন যা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে ছাত্রদের জন্যই লেখা হয়েছিল। সহজ-সরলভাবে বক্তব্যের প্রকাশে ও তথ্যের ব্যাপকতায় এগুলো অত্যন্ত আদরণীয় হয়েছিল সে যুগে। বাংলা গদ্যও তার স্বচ্ছন্দ আকার পাচ্ছিল ক্রমশ এই সব রচনার মাধ্যমে। বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানচর্চা সেকালে দুর্লভ ছিল বাংলা ভাষায়। তাই কোথাও কোথাও কঠিন ও আড়ষ্ট ভাষায় হলেও নতুন তথ্যের সমাবেশে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এইসব রচনার প্রয়োজনীয়তা ছিল অবশ্য স্বীকার্য।

এক্ষেত্রে স্বীকার্য সব লেখা মৌলিক না হলেও ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সরলভাষায় উপস্থাপন ও অনুবাদ করে অক্ষয় কুমার বাংলার তরুণ সমাজের প্রভূত উপকার করেছেন। তৈরি করেন অসংখ্য উপযুক্ত পরিভাষা যা আজও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ, সুমেরু, কুমেরু, আগ্নেয়গিরি, গ্রহণ, মাধ্যাকর্ষণ, ধ্রুবতারা, জড় পদাথ, দাহ্যপদার্থ, তড়িৎ, বজ্র, চুম্বক, অঙ্গার, সৌরজগৎ, রামধনু, মান-মন্দির ইত্যাদি আরো অনেক পরিভাষার বিকল্প ভাবাই যায় না আজও। মৌলিক ও সৃষ্টিশীল লেখক হিসেবে আজ অক্ষয়কুমার অপেক্ষাকৃত বিস্মরণের পথে। কিন্তু বাংলা ভাষায় পাঠ্যবইয়ের তথ্যবহুল সংযোজনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব ও গুরুত্ব দেখিয়েছিলেন। নবজাগরণের আহ্বায়ক সম্পাদক অক্ষয়কুমারের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে স্বয়ং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক মন্তব্যে জানান— "this magazine was at that time the missionary of European culture in the whole of Bengal. Akshay Kumar Dutta was the first writer to introduce western outlook and

mentality among the Bengali youths."

অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারায় যুক্তিবাদী প্রমাণের সঙ্গে ভাববাদী ভাবনার বিরোধও ঘটেছিল। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নয়, বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্পর্ককে ধরতে চেয়েছেন। ভারতীয় রীতিনীতির প্রয়োগ করে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরবৃত্তির সংযোগ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এখানেই তিনি সেযুগের পক্ষে এগিয়ে থাকা মানুষ, গতানুগতিক পথের যাত্রী নন। 'ধর্মনীতি' গ্রন্থে ঈশ্বরের অলৌকিকত্ব অস্বীকার করে বলেছেন বস্তুজগতের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া জ্ঞান, অনুসন্ধান ও ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে। তথ্যগত মৌলিক আলোচনায় সমৃদ্ধ এই রচনায় ভারতীয় হিন্দুদের প্রাচীন ও আধুনিক, শ্রদ্ধেয় ও ঘৃণ্য সংস্কার, সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায়, তাদের বিচিত্র আচরণ ব্যাখ্যা করেছেন।

বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গেছেন বারবার। 'প্রাচীন হিন্দুদিগের নৌযাত্রা'-য় প্রাচীন হিন্দু-ভারতের নৌবাণিজ্য সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন হাল্কা চালের সরসভাষায়। তাঁর সমস্ত রচনাভাণ্ডার তাঁকে চিন্তাশীল, অমিতজ্ঞানী ও শক্তিধর প্রাবন্ধিক হিসেবেই চিহ্নিত করে। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। 'নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠতা' প্রবন্ধ সেকালের অনেক তরুণকে আমিষ ত্যাগে উৎসাহিত করে, এমনকী 'নিরামিষভোজী পত্রিকা' নামে নতুন এক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। মদ্যপানের বিরুদ্ধেও তিনি একইরকম প্রভাব ফেলেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ পড়ে ব্রজসুন্দর মিত্র ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। পত্রিকার কাজে মগ্ন অক্ষয়কুমার সেসময়ে বিদ্যাসাগর প্রস্তাবিত সহকারী স্কুল-পরিদর্শকের ১৫০ টাকা পারিশ্রমিকের চাকরিও প্রত্যাখ্যান করেন। পরে তিনি নর্মালস্কুলের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন।

তত্ত্ববোধিনীর মাধ্যমে তিনি চাঁদের হাঁট বসিয়েছিলেন। যে Paper Committee -র মনোনয়নের মাধ্যমে প্রবন্ধ নির্বাচিত হতো তার সদস্যরা ছিলেন—বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক স্বয়ং। বিষয় বৈচিত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল অক্ষয়কুমারের পত্রিকা। এমনকী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে, বাঙালিদের অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত করে নিজেদের গঠন করার আহ্বান জানিয়েও এতে লেখা প্রকাশিত হতো। এটি বাংলা সংবাদপত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করে সার্বিকভাবে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিলে এবং ১৮৫৯-এ তত্ত্ববোধিনী সভা উঠে গেলে কমিটিও রহিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ এর দায়িত্ব নিলে অন্যান্য সম্পাদকের হাত ধরে পত্রিকা চলে ১৯৩২ পর্যন্ত কিন্তু তাঁর মতো মনস্বিতার পরিচয় কেউ এক্ষেত্রে দেখাতে পারেননি। অক্ষয়কুমার দেশজ এবং বিদেশীয় স্টুয়ার্ট মিল, স্পেনসার, কোঁতের বিশ্বজনীন আদর্শকে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে প্রতিফলিত করে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রজ্ঞাবান বিচক্ষণ প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার তাই আমাদের মনে অক্ষয় হয়েই থাকবেন। তাঁর দ্বিশতজন্মবার্ষিকীর পূর্তিতে তাঁকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

শতবর্ষের আলোকে তিন কিংবদন্তি

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
এফ.ই ৩৭৭

শতবর্ষের আলোকে তিন কিংবদন্তি—সত্যজিৎ রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত রবিশঙ্কর—এঁদের জীবনী এঁদের সৃষ্টি আমরা বারবার পড়েছি, দেখেছি, শুনেছি। এই ছোট্ট প্রবন্ধ তাঁদের জীবন আলেখ্যতে তথ্য ঠেসে লেখা উদ্দেশ্য নয়। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য একবার নিজের মনের আয়নায় খুঁজে দেখা কেন তাঁরা ভীষণভাবে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন আমাদের মানসপটে, আমাদের হৃদয়ে।

সত্যজিৎ রায় (জন্ম ২ মে ১৯২১) কে আপনি কিভাবে মনে রেখেছেন? ৩৬টি ছবির পরিচালক হিসেবে (২৯টি কাহিনিচিত্র, পাঁচটি তথ্যচিত্র ও দু'টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি) নাকি 'ফেলুদা', 'প্রফেসর শঙ্কু', 'তারিণীখুড়ো' সহ অসংখ্য সার্থক কিশোর গল্পের লেখক হিসেবে, নাকি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' বা 'হীরক রাজার দেশে'র সেইসব অমর গানের

গীতিকার, সুরকার হিসেবে, নাকি সম্পূর্ণ এক অন্য ধারার স্কেচ আর ছবি আঁকিয়ে হিসেবে? জানি, উত্তরটা সহজে দিতে পারবেন না। কারণ সত্যজিৎ এক নব্য বাঙালী সংস্কৃতির বীজ আমাদের ভেতর বপন করে দিয়ে গিয়েছেন। আর নিজে সেই সংস্কৃতির বীজটা নিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

৬০ বছর বয়সের ব্যবধান রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের। তবু সত্যজিৎ রবীন্দ্র সান্নিধ্য পেয়েছিলেন খুব অল্প বয়সেই। সেই ঘটনাটা অনেকেরই জানা। মা সুপ্রভা রায় ছোট্ট সত্যজিৎ-কে নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। সত্যজিৎ একটা নতুন বেগুনী মলাটের খাতা নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর নেবেন বলে। সেদিন রবীন্দ্রনাথ খাতাটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। পরেরদিন সত্যজিৎ মায়ের সঙ্গে আবার উত্তরায়ণে যান রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তখন খাতাটা ফেরত দেন সত্যজিৎ-কে। সেই খাতার মধ্যে লেখা ছিল এক চিরকালীন কবিতা, ''বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিয়ে গিয়েছি সিন্ধু। দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু।''

এ ছিল এক প্রকৃতি পাঠের হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ-কে সেই প্রকৃতিপাঠ আরও যেন উস্‌কে দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। যে সত্যজিৎ নিজের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় জুনির ভিসুয়ালাইজার হিসেবে, যে সত্যজিৎ ১৯৪৯ সালে ফরাসি চলচ্চিত্র পরিচালক জঁ রনোয়ার কলকাতায় 'দ্য রিভার' ছবির শ্যুটিং করতে এলে তাঁর সান্নিধ্য পেতে ছুটে গিয়েছিলেন, যে সত্যজিৎ ১৯৫০ সালে লন্ডনে গিয়ে ভিত্তোরিও দে সিকার লাদ্রি দি বিচিক্লেত্তে (বাইসাইকেল থিভস) ছবিটি দেখে চলচ্চিত্র পরিচালক হতে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সেই সত্যজিৎ কিন্তু তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণে বেছে নিলেন বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'কে। কোমল প্রকৃতি আর মানুষের রূঢ় জীবনসংগ্রাম সে গল্পে অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মিশে আছে।

'পথের পাঁচালী' একদিন ভারতীয় চলচ্চিত্রের নতুন দিশা হবে, নতুন ভাষা হবে, কিন্তু তার আগে নিজের দেশের মানুষরা এই অমর সৃষ্টির থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেন। পশ্চিম দেশে 'পথের পাঁচালী'কে নিয়ে যখন আলোড়ন

পড়ে গেল, সত্যজিৎ-এর পুরস্কারের ঝুলি উপচে পড়তে থাকল তখন আমরা বলতে ছাড়লাম না, সত্যজিৎ পশ্চিম দুনিয়ায় 'ভারতীয় গরিবী' বিক্রি করছেন। এই অভিযোগ আমরা ১৯৭৩ সালে 'অশনি সংকেত' (সেই বিভূতিভূষণের লেখা) পর্যন্ত করে গিয়েছি।

স্বদেশীয় এইসব মন্তব্য ও মূল্যায়ণ সত্যজিৎকে নিশ্চয়ই আহত করেছে কিন্তু নিরুৎসাহ করতে পারেনি। সত্যজিৎ একবার বলেছিলেন, 'আমি অনুভব করি যে, নায়কের ছাঁচে থাকা মানুষের তুলনায় রাস্তায় থাকা একটি সাধারণ মানুষকে বিষয় হিসেবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। তাঁদের আংশিক অন্ধকার, অস্পষ্ট শব্দগুলোই আমি ধরতে চাই, আবিষ্কার করতে চাই।' এই ভাবনাটাই আমরা দেখতে পেয়েছি 'নায়ক'-এ উত্তমকুমার অভিনীত চরিত্রের মধ্যে স্টারডমের খোলস ছাড়িয়ে এক সাধারণ মানুষকে আবিষ্কার করতে। আবার ঠিক এই ভাবনাটাই আমরা দেখতে পাই কলকাতার সমকালীন নাগরিক জীবন নিয়ে 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ' এবং 'জন অরণ্যে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই তিন চলচ্চিত্রেই কিন্তু তিনি নায়ক করেছিলেন তিন নবাগতকে।

'তিন কন্যা', 'চারুলতা' থেকে আরম্ভ করে 'ঘরে বাইরে' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে সত্যজিৎ নিজের সৃষ্টির শরিক করেছিলেন। আবার 'সদ্গতি' (কাহিনি, মুন্সী প্রেমচাঁদ)তে জাতপাতকে তীব্র কষাঘাত বা 'গণশত্রু' (মূল কাহিনি, হেনরিক ইবসেন)তে ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের চিরায়ত দ্বন্দ্বের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার জরুরী সামাজিক বার্তাকে সুচারুভাবে আমরা সত্যজিৎ-কে তুলে ধরতে দেখেছি। আর এখানেই আমরা খুঁজে পেয়েছি সেই সত্যজিৎ-কে যিনি মূল কাহিনিকে অপরিবর্তিত রেখে নিজের মত চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে কাহিনি ভেঙেছেন, গড়েছেন। সত্যজিৎ একবার প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, 'চিত্রনাট্য লেখার অভ্যাসকে আমি শখে পরিণত করেছি। আমি খুঁজে বের করতাম কোন গল্পটি চলচ্চিত্রের জন্যই তৈরি হয়েছে এবং আমি সেই গল্পটি নিজস্ব ঢঙে লিখতাম, এরপর আসল গল্পের সঙ্গে তুলনা করতাম।'

সত্যজিৎ-এর অমর সৃষ্টিগুলির মধ্যে বাচ্চাদের জন্য কাজগুলিও আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়ের রূপকথাধর্মী 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' যখন কিশোর পুত্রের অনুরোধে (সূত্র 'আমাদের কথা'—বিজয়া রায়) চলচ্চিত্রায়িত করলেন তখন আমরা পেলাম এক নতুন ভূতের রাজাকে, যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই বার্তা আর চিনলাম আরেক নতুন সত্যজিৎ-কে, গীতিকার ও সুরকার সত্যজিৎ। 'দেখোরে নয়ন মেলে', 'মহারাজা! তোমারে সেলাম', 'ও মন্ত্রী মশাই' বা 'ওরে বাবা দেখো চেয়ে' ইত্যাদি গানগুলো কখনও পুরনো হয়না। এই 'গুপী বাঘা'র মুক্তি পাওয়ার ১১ বছর পর 'হীরক রাজার দেশে' সিক্যুয়ালে আমরা সেই ঘরানাই দেখতে পাই। সত্যজিৎ যেমন বেঠোফেন, মোজার্ট, চাইকভ্স্কি, শোঁপার গভীর অনুরাগী ছিলেন সেরকমই ছিলেন ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত, পল্লীগীতির অনুরাগী। আমরা ফেলুদার আবহ সঙ্গীতে যেমন মোজার্টের সিমফনির অনুপ্রেরণা দেখেছি তেমনই 'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়' দেখেছি পল্লীগীতি বা 'পায়ে পড়ি বাঘ মামা'তে দক্ষিণ ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সরাসরি প্রভাব।

লেখক সত্যজিৎ আজও অসম্ভব জনপ্রিয় 'ফেলুদা', 'প্রফেসর শঙ্কু', 'তারিণীখুড়ো' সহ অসংখ্য কিশোর পাঠ্য গল্পের জন্য। ফেলুদা— গোয়েন্দা, 'প্রফেসর শঙ্কু'— বিজ্ঞানী, 'তারিণীখুড়ো'—গল্প বলিয়ে। তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্নধারা লেখা আজও তুমুল জনপ্রিয়তার মূল কারণ সত্যজিৎ-এর অত্যন্ত সহজ সরল ঝরঝরে ভাষা ও বর্ণনা। এ বিতর্ক আজও হয় 'সোনার কেল্লা' অত্যন্ত জনপ্রিয় সিনেমা না হলে 'ফেলুদা' এই পাঠক প্রিয়তা পেত কিনা, আমার

ধারণা, নিশ্চয়ই হত। সত্যজিৎ সফল চিত্রনাট্যকার এবং দক্ষ আঁকিয়ে ছিলেন বলেই বোধহয় এভাবে ফ্রেমের পর ফ্রেম গল্প পাঠকের মনে গেঁথে দিতে পারতেন। তিনি বলে গিয়েছেন, 'যখন আপনার গল্পে নতুন কোনও চরিত্রের আবির্ভাব ঘটবে, তখন অবশ্যই তার চেহারা ও পোশাকের বিস্তারিত বর্ণনা দেবেন। আপনি যদি সেটা না করেন তাহলে পাঠক নিজের মতো করে চিন্তা করে নেবে, যেটা পরবর্তীতে আপনার বর্ণনার সঙ্গে নাও মিলতে পারে।'

আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্যজিৎ 'সন্দেশ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং কাজটি উনি অত্যন্ত ভালবেসে করতেন। চলচ্চিত্র নিয়ে শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিয়মিত 'সন্দেশ'-এর জন্য ফেলুদা বা অন্যান্য গল্প লিখে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'নিজের মতো করে কাজ করার সুযোগ সবসময়ই পাওয়া যায়।'

১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল আমাদের ছেড়ে সত্যজিৎ চলে গেলেন। কবীর সুমন গান লিখলেন,

'বুদ্ধি আমার শাণিয়ে নেওয়া, কিছুই দৃষ্টি এড়ায় না
এদিক ওদিক বেড়ায় তবু, ভুলের পাড়া বেড়ায় না
দার্জিলিঙে, রাজস্থানে, গণ্ডগোলে গ্যাঙটকে
খুনখারাপী মূর্তি চুরি, লোভীর লালা লকলকে
গল্পে আমি দিব্যি ছিলাম, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত
আমার গল্প সঙ্গে নিয়ে, চলে গেলেন সত্যজিৎ।'

সত্যজিৎ চলে গেলেন কিন্তু হারিয়ে গেলেন না। গল্পে, গানে সিনেমায় তিনি প্রতি মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

এবার আরেকজন ছ'ফুট অতিক্রান্ত বাঙালী মননে চিরস্থায়ী হয়ে থাকা ব্যারিটোন গলার মানুষকে ফিরে দেখি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৬ জুন, ১৯২০)। ক্লান্ত রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে যদি শোনেন, 'এই রাত তোমার আমার' বা মেঘলা দিনে অথবা কুয়াশা মেখে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে যদি হঠাৎ করে রেডিওর এফএমে শোনেন, 'এ পথ যদি না শেষ হয়' আজও আপনি রোম্যান্টিসিজমের চূড়ান্তে পৌঁছে যাবেন, মনে হবে গায়ক শুধু আপনার জন্যই এই 'লাইভ' গাইছেন। এভাবেই হেমন্ত রয়েছেন আমাদের মনে। যদি আপনাকে হেমন্তর দশটা প্রিয় গানের তালিকা তৈরি করতে বলা হয় কিছুতেই সেই তালিকা দশের গণ্ডিতে রাখতেন পারবেন না।

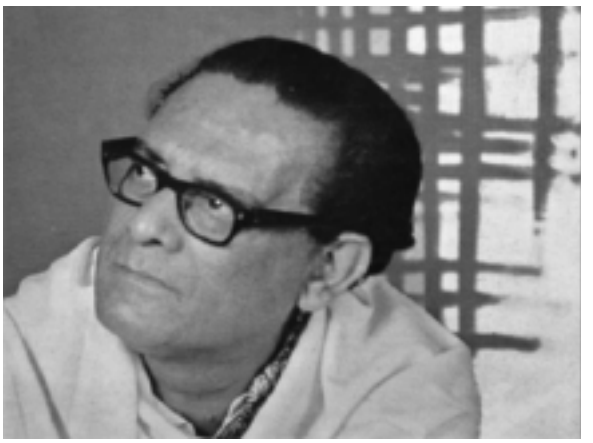

সাদা ধুতি আর হাতা গোটানো সাদা শার্ট পরা এই মানুষটিকে আপামর ভারতবাসী মনে বসিয়ে রেখেছেন 'হেমন্ত কুমার' উচ্চারণভেদে। উচ্চারণভেদে যাই হোক না কেন, এই স্পষ্ট উচ্চারণে গান গাইতে পারার ক্ষমতাই ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সফল হওয়ার প্রধান মন্ত্র। অস্পষ্ট উচ্চারণের যুগ থেকে স্পষ্ট উচ্চারণে গান গাওয়া ছিল এক গানের যুগ থেকে আধুনিক বাংলা গানের আরেক যুগে সেতু পেরিয়ে আসা।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম মামারবাড়ি বেনারসে। পরে তিনি কলকাতায় এসে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেছিলেন। সেখানেই তার বন্ধু হন বিখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট লেখক সন্তোষ কুমার ঘোষ। হেমন্ত তখন গল্প লিখতেন। দেশ পত্রিকায় তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, গল্পটির নাম 'একটি ঘটনা'। ভেবেছিলেন সাহিত্যিক হবেন। তখন ক্লাস নাইনে। বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জোরাজুরিতে আকাশবাণীতে তাঁর গান রেকর্ড করেন। সেই গান ছিল 'আমার গানেতে এলে নবরূপী চিরন্তনী'। সেই শুরু। বাড়িতে হারমোনিয়াম ছিল না। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান তুলতেন।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে গানে ভারতবর্ষ কাঁপাবেন যিনি, তিনি প্রযুক্তি শিক্ষায় আটকে থাকবেন কেন? বাবার অশেষ আপত্তি অগ্রাহ্য করে ছেড়ে দিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া, সাহিত্যিক হওয়ার বাসনায়।

প্রথম জীবনে হেমন্ত পঙ্কজ মল্লিককে অনুসরণ করতেন। তাই নাম হয়ে গিয়েছিল 'ছোটো পঙ্কজ'। কিছুদিন ফণীভূষণ ব্যানার্জি এবং ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ'য়ের কাছে ধ্রুপদী সংগীতের তালিম নিলেও প্রথাগত তালিম ছিল না বললেই চলে। অথচ পরবর্তীকালে আমরা বারবার দেখতে পেয়েছি তার গানে বিভিন্ন রাগ রাগিণীর প্রভাব। 'ও শাম কুছ অজিব থি' সেরকমই একটা উদাহরণ।

আকাশবাণী থেকে যাত্রা শুরু আর তারপর কখনো পিছনে ফিরতে হয়নি হেমন্তকে। ১৯৩৭ সালে গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়ার কলাম্বিয়া লেবেলে শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে দুটি আধুনিক গান রেকর্ড করেন, 'জানিতে যদি গো তুমি' এবং 'বলো গো বলো মোরে'। হেমন্তর মস্ত সুবিধা হয়েছিল বাংলা এবং হিন্দীতে সমান দক্ষ হওয়ায়। অচিরেই ১৯৪০ সালে কলম্বিয়া থেকে রেকর্ড করে ফেলতে পারলেন দুটি গান, 'কিতনা দুখ ভুলায়া তুমনে' এবং 'ও প্রীত নিভানেওয়ালি'। গান দুটির সুর করেছিলেন কমল দাশগুপ্ত, কথা লিখেছিলেন ফৈয়াজ হাশমি।

এর পাশাপাশি সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুপরামর্শে শুরু করলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা। রেকর্ড করলেন 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' আর 'আমার আর হবে না দেরি।' গানদুটি জনপ্রিয় হতেই সুযোগ হল চলচ্চিত্রে প্লে-ব্যাক করার। গাইলেন 'প্রিয় বান্ধবী' ছবিতে 'পথের শেষ কোথায় কী আছে শেষে'।

শুধুমাত্র জনপ্রিয় গায়ক হিসেবে নয়, পঞ্চাশের দশকে হেমন্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন সুরকার হিসেবেও। আরেকদিকে স্বাধীনতার কিছু পরে আইপিটিএ'র সদস্য হয়ে সলিল চৌধুরীকে জুটি করে সৃষ্টি হতে থাকল 'কোন এক গাঁয়ের বধূ', 'পালকির গান', 'অবাক পৃথিবী'র মত একের পর এক কালজয়ী গান। পঞ্চাশের দশকে হেমন্ত হলেন প্রযোজকও। মৃণাল সেন তার প্রযোজনায় করেছিলেন, 'নীল আকাশের নীচে'। হেমন্তর সহকারী সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল-এর মত বিখ্যাত সুরকাররা।

'আনন্দমঠ' ছবিতে ১৯৫২ সালে লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে প্লেব্যাক গাওয়ালেন হেমন্ত। 'আনন্দমঠ' এর যে 'বন্দেমাতরম' গানটি জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছিয়েছে তার পিছনে আছেন হেমন্ত। পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক হেমন্ত দাপটে রাজত্ব করেছেন কলকাতায় আর বোম্বেতে। একদিকে 'ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনী ফির কাঁহা', 'হ্যায় আপনা দিল তো আওয়ারা', 'মন ডোলে মেরা তন ডোলে'র মত একের পর এক সুপারহিট গান আরেকদিকে বাংলায় 'তুমি যে আমার', 'ও নদীরে', 'এই রাত তোমার আমার'। হেমন্তর হিট গানের লিষ্ট বাঙালিকে নতুন করে শোনানোর অপেক্ষা রাখে না।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ এ চলে গেলেন হেমন্ত। খবরের কাগজে শিরোনাম হল, শরতে হেমন্ত নেই। কিন্তু তার

গান 'নীড় ছোট ক্ষতি নেই, আকাশ তো বড়' আমাদের আজও প্রেরণা দেয়, যেন সেই সত্যজিৎ-এর কথাই প্রতিধ্বনিত হয়, 'নিজের মতো করে কাজ করার সুযোগ সবসময়ই পাওয়া যায়।'

ছ'ফুট অতিক্রান্ত দুই বাঙালীর পাশে সমবয়সী একজন ছোট্টখাট্ট মানুষ। সঙ্গীতের দুনিয়ায় কিংবদন্তি। ইজি চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে তাঁর বাজনা শুনলে সব ক্লান্তি কোথায় যেন উবে যায়। মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাঁর সুরের মায়ার কোনও 'এক্সপ্যায়ারি ডেট' নেই। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে তিনি সারাবিশ্বে শুধু পরিচিতই করাননি, পাশ্চাত্যের সঙ্গীতের তুলনায় ভারতীয় রাগসঙ্গীত যে অনেক উঁচুস্তরের এবং নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ, সেটি দেখিয়ে দিয়ে

গিয়েছেন। তিনি পণ্ডিত রবিশঙ্কর (জন্ম, ৭ এপ্রিল ১৯২০)।

রবিশঙ্করের পুরো নাম রবীন্দ্র শঙ্কর চৌধুরী, ডাক নাম

'রবু'। আদি পৈত্রিক বাড়ি বাংলাদেশের নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় হলেও তাঁরও জন্ম বেনারসে। বেশ আশ্চর্য সমাপতন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর রবিশঙ্করের জন্ম একই শহরে কিছুদিনের ব্যবধানে। রবিশঙ্কর ছিলেন চার ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বড় ভাই ছিলেন বিখ্যাত শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর। ইউরোপ আমেরিকায় অনুষ্ঠান করে বেড়াতেন উদয়শঙ্কর। খুব ছোট বয়স থেকে রবিশঙ্কর দাদার দলের নৃত্যশিল্পী হয়ে বিশ্বভ্রমণ করেছেন। এছাড়া টুকটাক সেতার বাজাতেন।

রবিশঙ্করের যখন বয়স ১৮ প্যারিসে উদয়শঙ্করের সঙ্গে অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন মাইহার ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা বাবা আলাউদ্দীন খান সাহেব। বাবা আলাউদ্দীন খানকে কাছ থেকে দেখে রবিশঙ্করের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। ঠিক করলেন বাবা আলাউদ্দীন খানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। বাবা 'রবু'র মধ্যে অশেষ সম্ভাবনা দেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'সব ছেড়ে যদি আসতে পারো, তবেই তোমাকে শেখাব।' ১৯৩৮ সালে উদয়শঙ্করের নাচের দল ছেড়েছুড়ে রবিশঙ্কর সেতার নিয়ে সত্যিই চলে এলেন মাইহারে। গুরুর কাছে নাড়া বাঁধলেন। কঠোর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হল। সঙ্গী পেলেন বাবা আলাউদ্দীন খানের পুত্র সরোদের অমর শিল্পী ওস্তাদ আলী আকবর খাঁকে। ১৯৩৮ থেকে দীর্ঘ সাত বছর নিবিড় তালিম নিলেন। ইতিমধ্যে সখ্যতা হয়েছিল বাবার কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে। বিয়ে করেছিলেন ওঁরা। যদিও সেই বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

১৯৩৯ সালে আহমেদাবাদে রবিশঙ্করের প্রথম সাধারণের জন্য উন্মুক্ত একক সেতার পরিবেশন অনুষ্ঠান হয়। সেই ছিল শুরু। এরপর প্রচুর একক এবং ওস্তাদ আলী আকবর খানকে জুটি করে বাজিয়েছেন অসংখ্য যুগলবন্দী। এই সময়ে রবিশঙ্কর তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে শুধুমাত্র মার্গীয় সঙ্গীতে আবদ্ধ রাখেননি। চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনাতেও আগ্রহ দেখান। 'ধরতী কি লাল' এবং 'নীচা নগর' চলচ্চিত্র দুটি সঙ্গীত রচনা ও সুরারোপ করেন। কবি ইকবালের 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' কবিতায় সুরারোপ করে গানটিকে অমর করেন। সত্যজিৎ রায়ের অপু ত্রয়ীর ('পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার') সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রবিশঙ্কর।

রবিশঙ্কর কিছুদিন আকাশবাণীর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ছিলেন, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গাঁধীজির মর্মান্তিক মৃত্যুর পরে তিনি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন, 'মোহনকোষ'। রেডিয়োয় সারা দিন ধরে মাঝে মাঝেই সেই রাগটি শোনানো হয়েছিল। সারা জীবনে তিনি একত্রিশটি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। 'পরমেশ্বরী', 'গঙ্গেশ্বরী', 'চারুকোষ' সেরকমই কিছু জনপ্রিয় রাগ।

১৯৫৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে রবিশঙ্কর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর সেতারবাদনকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রথম তুলে ধরেন। এরপর ১৯৫৬ সালে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন, এ সময় তিনি এডিনবার্গ ফেস্টিভালে এবং বিখ্যাত সঙ্গীত মঞ্চ রয়াল ফেস্টিভাল হলেও বাজিয়েছেন।

রবিশঙ্কর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত চর্চার বিষয়ে ঐতিহ্যমুখী ও শুদ্ধতাবাদী হলেও সুর নিয়ে পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে রীতিমত সমাদর করতেন। ইহুদি মেনুহিন থেকে আঁদ্রে প্রেভিন বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে কাজ করেছেন। প্রচুর কনসার্ট করেছেন। মেলবন্ধন করেছেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতধারার।

১৯৬৬ সালে বিটলস্-এর জর্জ হ্যারিসনের সাথে যোগাযোগের পর থেকেই এই বিষয়ে যুগ্মভাবে কাজ করেছেন এবং ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের মাধুর্য এবং ব্যাপ্তিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত

করেছেন। রবিশঙ্কর পপ সঙ্গীতের গুরু জর্জ হ্যারিসনের 'মেন্টর' হিসেবে পাশ্চাত্য সঙ্গীত জগতে পরিচিত হয়েছিলেন। এই বন্ধুত্ব রবিশঙ্করকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও পরিচিতি দেয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের বিপন্নতা রবিশঙ্করকে খুব বিচলিত করেছিল। এই সময় রবিশঙ্কর জর্জ হ্যারিসনকে সঙ্গে নিয়ে আয়োজন করেছিলেন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে প্রথম চ্যারিটি কনসার্ট। চ্যারিটি কনসার্টের এই উদ্যোগ আজও একটি মাইল ফলক হয়ে আছে।

১৯৯২ সালে হৃদরোগের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় নিজেকে একটু গুটিয়ে নেন। তবে তাঁর পাশে ছিলেন জর্জ হ্যারিসন। হ্যারিসনের সম্পাদনায় ১৯৯৬ সালে তিনি রচনা করেন 'রাগমালা'। ২০১২ সালের ১১ ডিসেম্বর রবিশঙ্কর চিরবিদায় নেন। কিন্তু তিনি আমাদের মনের মধ্যে রেখে দিয়ে গিয়েছেন সুরের মূর্ছনা।

তিন কিংবদন্তির শতবর্ষ এবছর। এ অভিশপ্ত বছরে হয়ত সেভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে না শতবর্ষের স্মরণ অনুষ্ঠান। কিন্তু গৃহবন্দী গুমোট সময়ে এই কিংবদন্তিরা সবসময়ে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের মন ভালো করে দেওয়ার জন্য গল্প, সিনেমা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মূর্ছনায়। শতবর্ষ কেন, যতদিন সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের অস্মিতা থাকবে, এঁরা আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেন। প্রণাম জানাই এঁদের।

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের সূত্র।